ISSN-2277-8780

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও তার সংকট

— রাকেল জানা
গবেষক ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিভূতিভূষণের উপন্যাস গভীর প্রকৃতি প্রেমের অন্তরালে আমরা দেখবো দরিদ্র পতিত জীবন ও নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বেদনা কম ছিল না। নিচের তলার মানুষের সঙ্গে একাত্মলাভের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তরধর্ম ও মানবপ্রবণতার পরিচয় পাই। 'পথের পাঁচালী'তে আমরা দেখেছি অপুর পিতা হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষ বীরু রায়ের ব্যবসা ছিল ডাকাতি করা, তার অধীনে একটা ঠ্যাঙাড়ে দল ছিল। তারা নিরীহ পথিকের প্রাণনাশ করে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিত—এই ছিল তাদের ব্যবসা। তারপর একদিন এক হেমন্তের রাত্রে দরিদ্র কপর্দকহীন ব্রাহ্মণ ও তার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে ঠাকুরঝি পুকুরে পুঁতে দেওয়ার একবছর বাদে ইছামতীর নির্জন চরে বীরু রায়ের একমাত্র পুত্রকে কুমীরে টেনে নিয়ে যায়। বীরু রায়ও এরপর বেশি দিন বাঁচে নি। সেইদিন থেকে ব্রহ্মশাপে তাদের বংশে জ্যেষ্ঠ সন্তান বাঁচতো না। একমাত্র হরিহরই সেই অধস্তন পুরুষ যে ঐ ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। হরিহর স্বপ্নবিলাসী-সংসা উদাসীন ভ্রাম্যমান কথক। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সংস্থানের চেষ্টায় সে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। এই উপন্যাসে হরিহর ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে নানা জীবিকার লোকজনের প্রসঙ্গ এসেছে। কখনো দেখা গেছে চিনিবাস ময়রাকে যে পেশায় ফেরিওয়ালা, শুধুমাত্র মাছ ছাড়া সে সব জিনিসের পণ্য মাথায় নিয়ে গ্রামে, হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ায়। তবে কোন ব্যবসাতেই সে সফল নয়। এসেছে প্রবঞ্চক পিতম কাঁসারির কথা, স্বর্ণ গোয়ালিনি ও কিনু জেলেনী, সীতানাথ রসুনচৌকি বাজিয়ে, নীলমণি হাজরার যাত্রাদলের কুশীলব অজয়ের কথা এছাড়াও গ্রামে বায়স্কোপ নিয়ে এসেছেন বাঙাল মুসলমান বৃদ্ধটি। নিশ্চিন্দপুর গ্রামে থেকে হরিহরের অভাব দূর হবে না বলে তারা স্বচ্ছলতার আশায় কাশী যায়। সেখানে হরিহর যজমানী বৃত্তিটি ছেড়ে কথক ঠাকুরের বৃত্তি নিয়েছে। কাশীতে এসে অপুর পল্টুর সাথে আলাপ হয়। তার বাবার কাশীতে ছোট্ট জমিদারী আছে তবে তাতে কিস্তি দিয়ে লাভ যৎসামান্য বলে তার বাবা কনট্রাক্টারীর কাজ করেন। আসলে সেই সময় জমিদারীতে আর সেরকম মুনাফা পাওয়া যেত না বলে সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে জমিদারকেও অন্য জীবিকার উপর নির্ভর করতে হত।

কাশীতে হরিহর নিজেকে প্রায় গুছিয়ে এনেছিল কিন্তু অকালে হরিহরের মৃত্যুতে পরিবারটি আবার দারিদ্র্যের পীড়নে অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে এক সময়ের গ্রাম্য পুরোহিত বধূ সর্বজয়াকে সংসারের ভরণ-পোষণ করতে ধনী পরিবারের দাসীবৃত্তি করতে দেখা যায়। এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ অর্থনৈতিক মানের বিচারে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণের মর্যাদার আসনটির স্খলন চ্যুত হতে দেখিয়েছেন। পথের পাঁচালীর বিস্তার ঘটেছে অপরাজিত (দুই খণ্ড)-তে। পথের পাঁচালীর শেষ খণ্ডে (অক্রূর সংবাদ) নিশ্চিন্দপুর ছেড়ে আসার পরে কাশীতে ও রায়চৌধুরীদের বাড়িতেও দারিদ্র্য অপুদের জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল। তবে এই দারিদ্র্য তাকে এতটা কষ্ট দেয়নি যতটা দিয়েছিল মানসিক দারিদ্র-গ্রাম ছেড়ে, প্রকৃতি ছেড়ে শহরে বসবাসের যন্ত্রণা। অপরাজিততে অপু তার মা সর্বজয়াকে নিয়ে দূরসম্পর্কের সর্বজয়ার জ্যাঠামশাই ভবতারণ চক্রবর্তীর বাড়ি-মনসাপোতায় যায়।

ISSN-2277-8780

এখানে অপু ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্পদ-প্রকৃতিকে। ধীরে ধীরে আড়বোয়াল মাইনর স্কুল, দেওয়ানপুর মডেল ইনস্টিটিউশনে পড়ে অপুর মানসিক জগত বিস্তারিত হয়। সে আর ছোট্ট চাষাগাঁয়ে ষষ্ঠি পূজা, মাকালপূজা করে দিন কাটাতে চায় না — তার জগত্ ভিন্ন। অপু এবার কলকাতায় কলেজে পড়তে যায়। তবে তার পড়া ও থাকার খরচ নিজেকে যোগাড় করতে হবে বলে বন্ধু অনিলের সাথে জাহাজের চাকরির সন্ধানে যায়। সেখানে গিয়ে জাহাজের এক বাঙালি কর্মচারী তাদের জাহাজে নানা অসুবিধার কথা শোনান-'জাহাজে চাকরি খুঁজছো- কোন চাকরি হবে জানো? খালাসীর চাকরি ... একবছরের এগ্রিমেন্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না ... কষ্টের একশেষ হবে, গোরা নস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েশ, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট — স্ট্রোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে — সে সব কি তোমাদের কাজ?" তার কথা শুনে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে অপু ফিরে আসে। নিজের খরচ চালাতে টিউশনপড়ায়, সংবাদপত্র বিক্রি করে। তার কলকাতায় পড়াকালীনই একদিন হঠাত্ সর্বজয়ার মৃত্যু হয়। মায়ের শ্রাদ্ধান্তে অপু আবার কলকাতায় ফিরে আসে। মায়ের মৃত্যু তাকে মুক্ত করেছে, তাই আর সে পড়াশুনো করতে চায় না। তাছাড়া পড়াশুনো করার খরচও যথেষ্ট তাই সে ঠিক করে চাকরি করবে। নানা ধররের চাকরির সন্ধান করেও মন্দার বাজারে তার চাকরি পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে। লোহার বাজারে দালালী করার চেষ্টাও তার ব্যর্থ হয়। তারপর বন্ধু প্রণবের সঙ্গে যোগাযোগ তার জীবনে নতুন মোড় নিয়ে আসে। ভাগ্যক্রমে চল্লিশ টাকা মাইনেতে ছোট্ট খবরের কাগজের অফিসে চাকরিও পায়। এরপর হঠাৎ একদিন খুলনার গঙ্গানন্দনকটি গ্রামে বন্ধুর বোন অপর্ণার বিয়েতে গিয়ে অপর্ণাকে লগ্নভ্রষ্টা হওয়া থেকে বাঁচাতে নিজে বিয়ে করে। অপর্ণার মধ্যে অপু সর্বজায়াকে খুঁজে পায়। এরপর শুরু হয় শ্রী গোপাল মল্লিক লেনের তের টাকার অন্ধকার ভাড়া বাড়িতে অনর্ণাকে নিয়ে অপুর দাম্পত্য জীবন। অপু শীলবাবুদের সেরেস্তায় দশটা — সাতটা কলমপেষা জীবিকায় একঘেঁয়ে জীবনযাপনে ক্রমশ হাঁপিয়ে ওঠে। এখানে তার স্বপ্নভঙ্গের ছবি — অফিস জীবনের বদ্ধতা, মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার মনের অনবরত লড়াই বিভূতিভূষণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবুও অপুর জীবনে অপর্ণার সাহচর্যের দিনগুলি মধুর ছিল। এরপর বিয়ের দু'বছর বাদে অপু সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় কিন্তু স্ত্রী অপর্ণাকে সেখানে রেখে আবার কলকাতার একঘেঁয়ে জীবনে ফিরে আসে। তিনমাস বাদে খবর আসে অপর্ণা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে। অপু আবার একা হয়ে যায়। কখনো স্কুলে শিক্ষকতা, কখনো দরিদ্র কবিরাজ বন্ধু সাথে চন্দ্রমুখী মাজন বিক্রি করে অপু লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায়। এবার তার লক্ষ্য বিদেশভ্রমণ, তবে তার আগে শ্বশুরবাড়িতে সন্তান কাজলকে দেখতে যায়। কাজলকে দেখে অপু ফিরে পায় তার শৈশবকে। তাও কাজলকে ছেড়ে অপু চলে যায় বহির্বিশ্বের আকর্ষণে — নাগপুরের কাছে রিজার্ভ ফরেস্ট উমেরিয়ায় পাহাড় ও রহস্যে ঘেরা অরণ্যের মধ্যে। এখানে ট্রেনে পরিচিত ভদ্রলোক জিয়লজিস্ট মিঃ রায়চৌধুরীর কাছে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে ড্রিলিং ও তাঁবু তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ পান। এরপর পাঁচ বছর ওখানে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে অপু। কলকাতায় ফিরে সে গল্প-উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়। খবর পায় বাল্যসখী লীলা আত্মহত্যা করেছে। নিঃসঙ্গ অপু এরপর আট বছরের পুত্র কাজলকে শ্বশুরবাড়ি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসে, সেখানে থেকে তাকে নিয়ে যায় নিশ্চিন্দিপুরে পূর্বপুরুষের ভিটেতে। অপু তার দ্বিতীয় সত্ত্বা কাজলকে ছেলেবেলার সাথী রানুদির কাছে রেখে আবার বিশ্বভ্রমণে বের হয়। জীবন চলতে থাকে তার ছন্দে;

ISSN-2277-8179

হরিহর-অপু-কাজল যেন তার অপরাজিত সৈনিক।

আমরা 'আরণ্যক' এর সূচনায় দেখি সত্যচরণকে একবছর হল স্কুলের চাকরি ছেড়ে কলকাতা শহরের বুকে চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে। "... চাকুরীর খোঁজ হেন মার্চেন্ট আফিস নাই — সেখানে অন্তত দশবার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলের এক কথা, চাকুরি খালি নাই।" সত্যচরণের বন্ধু সতীশ পেশায় আলিপুরের উকিল হলেও এই ব্যবসায় তার বিশেষ আয় হয় না; সে টিউশনি পড়িয়ে সংসার সমুদ্রে সে কোনো রকমে টিকে আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা চূড়ান্ত জীবিকা সংকট ও আর্থিক সংকটের মধ্যে উপন্যাসের সূচনা। আসলে ১৯২৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতির বেহাল দশা সম্পর্কে লেখক অবহিত ছিলেন। তাই সাহিত্যে তার প্রভাব রয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যচরণের চাকরি জোটে বন্ধু অনিবাশের সুপারিশে কালকাতা শহর থেকে বহুদূরে পুর্ণিয়া জেলার এক জঙ্গলমহলে। তার কাজ এই জঙ্গলমহলের বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি বন্দোবস্ত করা। এই লেখার যেমন এসেছে একাকিত্বের কথা, গাছপালার কথা, তেমনি লেখায় ফুটে উঠেছে বড়লোক জমিদার ও মহাজনদের কথা। আর রয়েছে সেই সব দুঃখী ভূমিহীন কৃষকদের জীবনের কথা যারা ঠিকমত আহার জোটে না। তারা এজন্য প্রতিবাদ করেনি দারিদ্র্যকে নিজেদের নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। সত্যচরণ এখানে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের গাঙ্গোত জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই গাঙ্গোত জাতির উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন। উপন্যাস যত এগিয়েছে সত্যচরণের চোখ দিয়ে আমরা ভালো-মন্দ নানান বৃত্তিজীবী লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কখনো দেখেছি রাসবিহারী সিং, ছট্টু সিং ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার মতো দুঁদে মহাজনদের আবার কখনো সরল স্বভাব উদার মটুকনাথ পাঁড়ে, আবার কখনো চাষবাস করতে আসা ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ের মতো জনহিতব্রতী মানুষ মন ছুঁয়ে যায়। শুওরমারী গ্রামে কলেরায় মড়ক লাগলে গাছপড়ার ওষুধ দিয়ে তার মুহূর্ষ রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা সত্যচরণকেও অবাক করে দেয়। এখানে জনবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজও বেড়েছে। ফসল পাকার পর নানা প্রান্ত থেকে এসেছে কাটুনি মজুরের দল আর এদের বিনোদন করতে এসেছে নাটুয়া ধাতুরিয়ার মতো আঞ্চলিক নৃত্যশিল্পীরা। তাদের এই নৃত্য শহরে থিয়েটার-চলচ্চিত্রের ফ্যাশনে অভ্যস্ত ভদ্রলোকেদের হয়তো ভালো লাগবে না। তাই ধাতুরিয়ার মতো 'ছক্কর বাজি' নৃত্যশিল্পী আশা রাখে শহুরে লোকেদের মনোরঞ্জন করার।

এই উপন্যাসে লেখক নানা বৃত্তিজীবী চিত্রণ এর পাশাপাশি একটি বিলুপ্ত প্রায় জীবিকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপনের পূর্বে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক — "বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলার বহু মানুষ গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে জীবিকা অর্জন করতো। কাঠকয়লার টিকে, গুল ঘুঁটে জ্বালানি হিসেবে খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। বর্তমানে কাঠকয়লার টিকে, গুল প্রায় পাওয়া যায় না। টিকের কারিগররা বঙ্গ সমাজ থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে বললেই চলে"[৩] (তথ্যসূত্র-জিতেন্দ্রনাথ রায়। বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস। পৃ-১৬)। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না আমরা কাঠকয়লার টিকে বিক্রিয় বিলুপ্তপ্রায় জীবিকার প্রসঙ্গটির কথা বলছি। টিকে তৈরি করা হয় জঙ্গলের কাঠ পুড়িয়ে। এই টিকে অতি সস্তা তাই গ্রামের অতি দরিদ্র মানুষ শীতনিবারণার্থে এই কয়লা ব্যবহার করেছে। টিকে প্রস্তুতকারকগণ জঙ্গলের মধ্যে সত্যচরণকে দেখে ফরেস্ট অফিসার ভেবে ভয় পেয়েছে কারণ এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ।

'স্মৃতিরেখা'য় পথের পাঁচালী অংশে লেখক একবার বলেছিলেন — 'মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোন লেখকই যেতে পারেন না।' এই বক্তব্যের সমর্থন করেই 'অনুবর্তন' উপন্যাসের দিকে এগানো যাক। বিভূতিভূষণ জীবনের অনেকটা সময়কালই শিক্ষকতা বৃত্তিতে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও সে সময়ের বাঙালি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের জীবন

ISSN-2277-8780

ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়েছে 'অনুবর্তন' উপন্যাস। এই ধরণের জীবনের ছবি 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর শিক্ষকতার সূত্রেও এসেছে। বাংলা সাহিত্যে স্কুল শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-'মাস্টার মহায়', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস – 'পণ্ডিত মশাই' ও 'পল্লীসমাজ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প-'টিচার', প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প-'গদাধর পণ্ডিত', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প-'হেড মাস্টার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের-'ভাঙা চশমা' প্রমুখ।

জেনস হিলটন রচিত 'গুডবাই মিঃ চিপস' (১৯৩৪) উন্যাসের ব্রুকফিল্ড গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিস্টার চিপিং এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তন' উপন্যাসের ক্লার্কওয়েল মডার্ন ইনস্টিটিউশন এর হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েলের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর স্কুল চালানোর অনমনীয় মনোভাব, প্রথাসিদ্ধ আদবকায়দা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁকে অন্যান্য শিক্ষকের থেকে পৃথক করে। এই উপন্যাসে শিক্ষকদের বৃত্তিগত জীবনে আর্থিক সঙ্গতি-অসংগতি ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনও চিত্রিত হয়েছে। যদুবাবুর মতো শিক্ষকদের তিরিশ টাকা মাইনেতে সংসার চলে না বলে টিউশনি জরুরী হয়ে পড়ে। আবার ক্ষেত্রবাবুকে দেখা যায় সন্ধ্যোবেলা হোমিওপ্যাথি করে সামান্য উপার্জনের সাহায্য নিয়ে সংসার চালাতে। এছাড়াও গৃহ ও পরিবার পরিজন ছেড়ে আসা শিক্ষক জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়কে দেখা গেছে লোকের ভবিষ্যত্ গণনার দ্বারা ঠিকুচি-কুষ্ঠি তৈরি করে সংসারের খরচের কিছুটা ব্যয়ভার লাঘব করতে। শিক্ষকেরা টিউশনি করতে গিয়ে ছাত্রের অভিভাবকের কাছে অসম্মানিত হয়েছেন। নারানবাবুর টিউশনির ছাত্রের অভিভাবক ফি মাসে এতোগুলো করে টাকা দেন বলে চাকর আর শিক্ষকদের মধ্যে ভেদ করেননি। রবীন্দ্রনাথের 'মাস্টার মশায়' ছোটগল্পেও বড়লোকের ঘরে টিউশনির মাস্টারের পদমর্যাদার প্রসঙ্গে ঠিক এই রকমই ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে — 'গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে'। তবুও শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষাদানের আদর্শ থেকে চ্যুত হন না। এই উপন্যাসেই রাখাল মৈত্রের মত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনশনদীর্ণ জীবন চিত্রায়িত হয়েছে। অবসরের পর তিনি স্কুলপাঠ্য বই লিখে স্কুলে স্কুলে চালানোর চেষ্টা করে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়েছেন। অথচ স্কুলগুলি তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক গুলিকে পুরোনো মেথড বলে রিজেক্ট করলে তাঁর চরম অর্থাভাবে দিন কাটে। এরপর পাশাপাশি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে ও স্কুলের পরীক্ষার ফল খারাপ হলে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। তাছাড়া ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক মতো মাইনে আদায় হয় না বলেও শিক্ষকদের বেতন অনেক কমে যায়। মাসান্তে অনিয়মিত স্বল্প মাইনে ও দেশের তৎকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে দ্রব্যমূল্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সংসারের ভরণ-পোষণ তো দূরে কথা শিক্ষকদের নিজেদের পেট চালানো মুশকিল হয়ে যায়। এই ঘোরতর সংকটকালে শিক্ষকেরা চরম দুর্ভোগের শিকার হন, পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে এসেও সংকট কাটে না। উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায় ছুটির পর নতুন বছরে স্কুল খুললে প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যা অনেক কমে যায় তাই অনেকে বলতে শুরু করেন স্কুল বন্ধ হল বলে। বর্তমানে স্কুলে দু-তিন জন পুরানো শিক্ষক ছাড়া অনেক নতুন শিক্ষক যোগদান করেছেন। স্কুলের সার্কুলার বুকে যাদুবাবুর মৃত্যুর জন্য একদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে; এইভাবেই অনুবর্তন চলে স্কুল শিক্ষকদের।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসটি মাতৃভূমি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় ১৯৩৮-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ তিনি যখন এই উপন্যাস রচনা করছেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল। ভারতবর্ষে তখন চূড়ান্ত খাদ্যসংকটের সময়। বিশ্বজুড়ে মুদ্রামূল্যের হ্রাসে দেশের অর্থনীতির তখন

ISSN-2277-8780

ভঙ্গুর দশার সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন তখন বিপর্যস্ত। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে world economic conference এ চৌষট্টিটি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেও এই অর্থসংকটের মীমাংসা করতে পারেনি। ঠিক এই রকমই একটি পরিস্থিতিতে মধ্যবয়স্ক এক বাঙালি কর্মশক্তি উপর ভর করে স্বপ্নপুরন করেছে। আত্মসর্বস্ব চাকরি লোভী বাঙালি বাবু চরিত্রের বিপরীতে পাচক হাজারী ঠাকুর সহায়তাকারিণীদের সমবায় পদ্ধতিতে স্বল্প স্বল্প সঞ্চয় একত্রিত করে আদর্শ হিন্দু হোটেল খুলেছে। পাকা ব্যাবসাদারের মতো সে হ্যাণ্ডনোট লিখে সহায়তাকারিণীদের সুদ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। শুদু সহায়তাকারিণীদের সে উন্নতি করেনি এককালে তার উপর অন্যায়কারী মনিব বেচু চক্রবর্তী ও পদ্মঝিকেও আশ্রয় দিয়ে তার মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। তার হাতের রান্নার গুনপনার রাণাঘাটে রেলওয়ে থেকে ক্যান্টিন খোলারও কনট্রাক্ট পেয়েছে। শুধু এখানে লেখক তার উত্থানকে সীমিত করে রাখেননি বোম্বাইয়ের নামকরা রেষ্টুরেন্টে রাঁধুনি হিসেবে ডাক পেয়েছে। নির্জন দুপুরে রাধাবল্লভ তলার নাটমন্দিরে চূর্ণি নদীর শান্ত জলধারা দেখতে দেখতে হাজারী আদর্শ হিন্দু হোটেল খোলার যে স্বপ্নের জাল বুনেছিল তার বাস্তবায়নের কাহিনী শোনালেন বিভূতিভূষণ। এই হাজারী বাস্তবের জীবন্ত চরিত্র, 'উর্মিমুখর' দিনপঞ্জিতে বিভূতিভূষণ এই কথা জানিয়েছেন। একদিন ট্রেনে আসার সময় তাঁর সঙ্গে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ হাজারী পরটার পরিচয় হয়েছিল, যার সুনাম সুদূর কলকাতা অবধি ছিল। তার হাতের রান্না যে খেয়েছে সে কখনো ভুলতে পারেনি। ঐ হাজারী পরটা সুন্দর পরটা বানাতো বলেই লোকমুখে তার এরূপ নামকরণ।

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে দাম্পত্য বহির্ভূত প্রেমের চিত্র ছাড়াও কিছু জীবিকা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। উপন্যাসের নায়ক সংসার উদাসীন বিপিনকে জমিদার কন্যা মানী নিয়ন্ত্রণ করে সংসারের পথে নিয়ে এসেছে। তারই দেওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে বিপিন জমিদারের গোমস্তাগিরির মতো প্রজাশোষনের হীনবৃত্তি ছেড়ে পিপলিপাড়ায় ডাক্তারীর সেবাবৃত্তির মতো মহতবৃত্তিকে জীবনের আদর্শ করেছে। এই উপন্যাসে পিতার মৃত্যুর পর বিপিনের ভাই বলাই সংসার প্রতিপালন করতে গাড়োয়ানি করেছে। কারণ সে সময় বিপিন সংসারের প্রতি উদাসীন ছিল তাই বলাই শরীরের দিকে না তাকিয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে। অবশেষে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে তাও বাধা না মেনে পরিশ্রম করে ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তবে বলাইয়ের এই মৃত্যুই বিপিনের চোখ খুলে দেয়। পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা ছাড়া ভেতরে ভেতরে তাদেরই মত দরিদ্র ও আর্তজনের সেবার মানসিকতা নিয়েই সে এই বৃত্তিতে এসেছে। বিপিন ডাক্তার যেন বিভূতিভূষণের ছোট গল্প 'মনিডাক্তার'-এর দোসর।

'দুই বাড়ি' উপন্যাসে কুড়ুলগাছি গ্রামে সে দিন আর নেই, ছনু জেলের কাছে মাছ নিয়ে রামতারন চৌধুরী পয়সা ফাঁকি দেনে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ছনু তাঁর বিরুদ্ধে কাছারিতে গিয়ে নালিশ করে ন্যায্য পয়সা আদার করে। এই রামতারনের বড় ছেলে নিধি সবে মোক্তারি পাশ করেছে, এখনো প্র্যাকটিশে নামেনি। তাই রামতারন তাকে বাল্যবন্ধু যদু মোক্তারের কাছে প্র্যাকটিশ করতে শহরে পাঠান। যদু মোক্তার এখন নামকরা উকিল কিন্তু প্রথম যখন সে এই মহকুমায় প্র্যাকটিশ করতে এসেছিলেন তখন অনেক সুবিধে ছিল। এখন কাল বদলেছে, মোক্তারি ব্যবসা এখন সহজ নয়। যদুর নিজস্ব জবানীতে — 'সে কাল কী আর আছে বাবাজি? আমরা যখন প্রথম বসি প্র্যাকটিশে সে কাল গিয়েচে। এখন ওই কোর্টের অশথ্থতলায় গিয়ে দ্যাখো একটা লাঠি মারলে তিনটে মোক্তার মরে। কার পসার নেই। আবার কেউ-কেউ কোর্ট প্যান্ট পরে আসে মক্কেল কিছুতেই ভোলে না'। তাই যদু নিধিকে মোক্তারি ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ দেন, এতে বলা হয় — মোক্তারি করতে গেলে প্রথমত জেরা ভালো করে করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মক্কেলকে মিথ্যা কথা শেখাতে হবে।

ISSN-2277-8780

তৃতীয়ত, কেস জেতা আর হারা হাকিমকে সন্তুষ্ট করে চলতে হবে চটালে চলবে না। চতুর্থত, মক্কেল যদি আগে থেকে কেসের মিটমাট না চায় তাহলে নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে মীমাংসা না করাই ভালো। মোট কথা হল — মীমাংসা-ভদ্রতা-ন্যায়-অন্যায় এ বোধ দেখালে মোক্তারি ব্যবসা চলবে না। তাই নিধির এসব লোকঠকানো কারবার ভালো লাগে না — 'আজ বারো মাসের মোক্তারি জীবনে নিধু এরকম অনেক দেখিল এক-একবার তাহার মনে হয় এর চেয়ে ইস্কুল মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল। এ দুঃখের কথা। পলে-পলে মনুষ্যত্বের এই মরণ — কাহার কাছে এসব কথা ব্যক্ত করিবে সে?'[৫] এখানে মক্কেলরাও কম যায় না, তারাও সুযোগ পেলেই মোক্তারদের ফাঁকি দেয়। শুধু মুখের কথায় মক্কেল থাকে না তাদের কাছে টাকা নিয়ে মক্কেলনামায় সই না করলেই কেস হাতে পাওয়া যায়। নয়তো মক্কেল অন্য মোক্তারকে দিয়ে কেস লড়াতে পারে। হাকিম সুনীলবাবু একদিন নিধিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন; এই পরিচিতি নিধির পসারের পক্ষে ভালো। পূর্বে উনবিংশ শদাব্দীতে আদালদ জীবিকা ছিল সমাজের চোখে আদর্শ জীবিকা, এঁরা সমাজের মান্য-গণ্য ব্যক্তি। মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে শৈলবালা ঘোষ জায়া 'ননী খানসামার ছুটি যাপন'-এ পরাণচন্দ্র বলেছেন — ''আহা মানুষ গাঁটের কড়ি খচর করে যদি কোন বিদ্যে শেখেতো সে যেন ওকালতী শেখে। ... আহা কত মানের ব্যবসা বল দেখি, রাজা উজির এসে পায় তেল মালিশ করে, জজসাহেব হুকুমের ইশারায় কলম চালায়, এমন বিদ্যে কি আর আছে গাস।''[৬] শৈলবালা ঘোষ জায়ার গল্প সংকলন, সংকলন-অভিজিত সেন অনিন্দিতা ভাদুড়ি, দে'জ পাবলিশিং কোল-৭৩, পৃ-২৬) আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'একরাত্রি' ছোটগল্পে বলেছেন— '...ইহাঁরা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাঁদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি; সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইহাঁরাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন'।[৭] তবে কালে কালে এই বৃত্তির মর্যাদা হ্রাস ঘটে। তাই নিধি আইন রক্ষকদের এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানে হীনমন্যতায় ভোগে; বৃত্তিটির মাহাত্ম নষ্ট হয়।

'দম্পতি' উপন্যাসে পাটের আড়তদার গদাধর বসুকে গ্রামাঞ্চলের হিসেবে বিস্তর অর্থউপার্জন করতে দেখা যায়। 'গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন — অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও পাড়াগাঁ হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ'হাজার টাকা নিট মুনাফা সিন্ধুকজাত করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে — প্রতিবেশী — মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ভ্রমের পাত্র'।[৮] উপন্যাসে সূচনা থেকেই দেখা যায় বিভূতিভূষণ কলকাতার অর্থনৈতিক স্তর ও গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক স্তরের তুলনা টেনে প্রচ্ছন্নে শহরঅর্থনীতির গুণকীর্তন করে গদাধরের কলকাতা গমনের প্রবেশ পথ তৈরি করেছেন। এখানে এসেছে গদাধরের কর্মচারী নিধু সার কথা। সে ভালো কয়ালী, আজ ত্রিশ বছর সে এই লাইনে থেকে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। কাঁটায় মাল ওঠার আগে মালটা ভেজা কি শুকনো এটা যাচাই করার দায়িত্ব তার। একাজে সে দুর্নীতি করে না এমন নয়, তবে গদাধরের মুহুরী ভড় মশাই-এর মতে — 'নিধু স চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী কাজে ঝুনা লোক চলে গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন'।[৯] শুধু পাটের কারবার ছাড়াও গদাধরের পিতার আমলে এক তালুক ছিল সেখান থেকেও তার আয় যথেষ্ট ছিল। উপন্যাসের সূচনায় পাটের আড়তদার গদাধরকে খুব হিসেবী ব্যবসাদার হিসেবে দেখানো হয়েছে। জরাজীর্ণ বাড়ি সারিয়ে টাকা নষ্ট করতে সে নারাজ। তার থেকে তার ইচ্ছে কলকাতা শহরে বাড়ি করে ব্যবসা স্থানান্তরিত করা। সেই ইচ্ছার বশেই এছাড়া সন্তানদের পড়াশুনার সুবিধার্থে তিনি কলকাতায় বাড়ি কিনে সপরিবারে গিয়ে ওঠেন;

ISSN-2277-8780

ব্যবসাও কলকাতায় স্থানান্তিরত হয়। তাঁর ও অনঙ্গের সুন্দর স্বচ্ছল দাম্পত্য জীবনে এতদিন দুর্যোগের কালো ছায়া পড়েনি। কিন্তু কলকাতায় হঠাৎ একদিন সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই, ফিল্ম স্টুডিয়োর বাজনাদার শচীনের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই গদাধরকে ফিল্ম জগতের লোকজনের সান্নিধ্যে এনে ফিল্ম তৈরির ভূত মাথায় চাপায়। আসলে ফিল্ম জগতের জৌলুস, নারীদের সংসর্গ ও ধনীব্যক্তি হওয়ার হাতছানি তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাই পাটের ব্যবসার টাকা ফিল্ম কোম্পনীতে ঢেলে তিনি রাতারাতি বড়লোক হতে চান। তাঁর শুভাকাঙ্খি ভড় মশাই মনিবের এই সিদ্ধান্তে বিচলিত — 'এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটী লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনও।'[১০]

তাঁর এই আশঙ্কাই পরবর্তীকালে সত্যি হয়ে যায়। গদাধরের 'ভারতী ফিল্ম কোম্পানী' ক্ষতির মুখ দেখে। তাও গদাধর ফিল্ম বানানো ছাড়েন না। এরপর সিনেমার জন্য বাড়ি, তালুক, ব্যবসা সমস্ত কিছু খুইয়ে নিঃস্ব অবস্থায় কলকাতার মেসে পড়ে থাকেন। তাঁর পরিবার দরিদ্র্য অবস্থায় গ্রামে ফিরে আসে। এই ফিল্ম লাইনে নামা নিয়ে তিনি কারো নিষেধ শোনেন নি। আসলে তিনি শোভারাণী নাম্নী এক অভিনেত্রীর প্রেসে পড়েছিলেন। গ্রামে স্ত্রী অনঙ্গকে এরপর স্বামীর দেনাশোধ ও সংসার প্রতিপালনের ভার নিয়ে ব্যবসায় নামতে দেখা যায়। বিচক্ষণ ভড় মশাই-এর সাহচর্যে সে সফল হয়; তাদের অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হয়। তাই অর্থ জমিয়ে অনঙ্গ স্বামীকে সহায়তা করতে ভড় মশাইকে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠায়। ভড় মশাই কলকাতায় এসে অন্য রূপে গদাধরকে দেখতে পান। সে এখন সফল ফিল্ম নির্মাতা,বাড়ি-গাড়ি কী নেই! আর খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে শোভারাণীর জন্যই তাঁর এই সুদিন ফিরে এসেছে, তাই তাঁরা একসঙ্গে থাকেন — স্বামী-স্ত্রীর মত। এই অন্য এক দাম্পত্যের ইঙ্গিত দিয়ে বিভূতিভূষন উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন।

'ইছামতী' উপন্যাসে গঞ্জের হাটে সামান্য পানের বরজ বিক্রেতা নালু পাল ও তেল বিক্রেতা সতীশ সাধু খাঁর নিজের প্রচেষ্টায় আড়তদার হয়ে প্রভূত সম্পত্তি করে নীলকুঠি কেনে বিভূতিভূষন ঘটনাক্রমে তার উত্থান পর্বটি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। কথায় বলে না 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী', তবে তার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড অধ্যাবসায়, কঠোর শ্রমপ্রদান ও বাস্তবিক বুদ্ধি। এই সব কিছুই নালুর কাছে পূর্ণ মাত্রায় ছিল না শুধু পুঁজি; তাও নিজের বুদ্ধির জোরে সে উন্নতি করেছে। নালুর এই সাফল্য বাঙালিদের অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবে; যার সার্থক স্রষ্টা বিভূতিভূষন।

'অশনি সংকেত'-এ লেখক দেখিয়েছেন একটা দুর্ভিক্ষ মানুষের জীবনে কত পরিবর্তনই না এনে দেয়। উপন্যাসে দেখা যায় গঙ্গাচরণ ছাগলের গ্রাস থেকে সামান্য বেগুন খেত রক্ষা করতে যাওয়ায় পুত্র পটসকে তিরস্কার করেছে — 'ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কী কাপালীর ছেলের মতো দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত? ... না ওসব শিক্ষে ভালো না'।[১১] সেই আজ দুর্ভিক্ষের শেষলগ্নে ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামি বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণকে লাঙল ধরতে পরামর্শ দিয়েছে — 'জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার উপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা। ... আমাদের ভদ্রলোকদের কতকগুলো মস্ত দোষ আছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব। এবার টের পাচ্ছি মজা। ... এবার যদি নিজের হাটে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব — একটু জমি পেলে হয়'।[১২] সংকটকালে এভাবেই বদলে গেছে সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য। তার বদলে লক্ষ্য করা গেছে অবস্থান নিরপেক্ষ পারস্পরিক আদান-প্রদান; যার অন্যতম উদাহরণ অনঙ্গ। যদিও ঐতিহাসিক ভাবে এই মতকে কেউ সমর্থন করেন না তাও বিভূতিভূষণের অন্তরধর্মে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ISSN-2277-8780

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাঁর বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার দর্পণে নির্মিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকে বিভূতিভূষণ পিতা মহানন্দকে যজমানি ও পুজো অর্চনা করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখেছেন। মহানন্দের ঘরে ছিল নিত্য অভাব। তাই দেখা যাচ্ছে বিভূতিভূষণের ছোটবেলা থেকেই যেন 'পথের পাঁচালী'র প্রেক্ষাপট নির্মিত হচ্ছিল। ১৯২৩ সালে তিনি খেলাত চন্দ্র ঘোষ কোম্পানীর গৃহশিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজে যোগদান করেন। ১৯২৪-এ তিনি ওই কোম্পানীর এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার রূপে ভাগলপুর যান। এখনকার দিন গুলোর কথাই তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। ১৯২৯ সালে ভাগলপুর থেকে তাঁর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ঘটলে ওই কোম্পানীরই এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার রূপে ভাগলপুর যান। এখনকার দিন গুলোর কথাই তাঁর 'আরণ্যকে' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। ১৯২৯ সালে ভাগলপুর থেকে তাঁর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ঘটলে ওই কোম্পানীরই ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত 'খেলাত চন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন'-এ শিক্ষাকতা কর্বে নিযুক্ত হন। তাঁর এই স্কুলের অভিজ্ঞতাই 'অনুবর্তন' উপন্যাস লেখায় সহায়ক হয়ে উঠেছে। আবার ব্যারাকপুরের স্মৃতি নিয়ে রচিত হয় 'ইছামতী' উপন্যাসটি। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি প্রেমের অন্তরালে মানুষের সুখ-দুঃখময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এখানে যেমন এসেছে নানা জীবিকার প্রসঙ্গ, ঠিক তেমনি ভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের জীবিকা সংকট তথা বহুমুখী সংকটের চিত্রও দক্ষতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা, অপরাজিতা কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৬। পৃ.- ৬৪।

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। আরণ্যক। কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৬। পৃ.-

৩। জিতেন্দ্রনাথ রায়। বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস। দে'জ পাবলিশার্স। কলকাতা। জানুয়ারি, ২০০৫। পৃ.-১৬

৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়াণী ২০০৫। দুইবাড়ি, পৃ.-৪১৫

৫। তবেদ, পৃ.-৪৪৮।

৬। শৈলবালা ঘোষ জায়া। শৈলবালা ঘোষ জায়ার গল্প সংকলন, দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা ননী খানসামার ছুটি যাপন। পৃ.-২৬।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পগুচ্ছ। সন্দীপ বুক সেন্টার। কলকাতা, বইমেলা, ২০০৪। একরাত্রি। পৃ.-৪৭।

৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৫। দম্পতি। পৃ.-৭৯১।

৯। তদেব। পৃ.-৭৯২-৭৯২।

১০। তদেব। পৃ.-৮৩৯।

১১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড। অশনি সংকেত। পৃ.-৮৬৪।

১২। তদেব, পৃ.-৯৩১।